দিবস

ম. আখতারুজ্জামান

একচল্লিশতম বিশ্ব শিক্ষক দিবসের স্লোগান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

ইউনেস্কোর আয়োজনে অক্টোবর ১৯৪৬ প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয় একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন। নানা দেশের সরকারি প্রতিনিধি ও বেসরকারি সংগঠনের নেতারা এতে যোগ দেন। ওই সম্মেলন প্রণয়ন করে 'শিক্ষকদের মর্যাদা' বিষয়ক একটি সুপারিশমালা। পরে আইএলও এটি অনুমোদন করে। এতে ছিল মূলত বিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষকদের কথা। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষকদের জন্য ওই সংস্থা দুটো ১৯৭৭ সালে একটি ও ১৯৯৮ সালে দুটি ঘোষণাপত্র তৈরি করে। শিক্ষকদের অধিকার, মর্যাদা ও কর্তব্য সংক্রান্ত সুপারিশমালার প্রথমটি যেহেতু ৫ অক্টোবর গৃহীত হয়, সেহেতু ইউনেস্কো ১৯৯৮ সালে এ দিবসটিকে বিশ্ব শিক্ষক দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। তখন থেকে এ দিবসটি দুনিয়াজুড়ে পালিত হয়ে আসছে। এ বছরও বিশ্বের শতাধিক দেশে এ দিবসটি পালিত হবে।

এ দিবস উপলক্ষে ইউনেস্কো প্রতি বছর প্রচার করে কিছু স্লোগান। এবারের ছয়টি স্লোগান হচ্ছে :

উপযুক্ত কর্মপরিবেশ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের জন্য উপযুক্ত আকারের শ্রেণীকক্ষ, শিক্ষাদানের উপযোগী উপকরণ সরবরাহ করা।

জীবন ধারণের উপযোগী বেতন-ভাতা দাও,

শিক্ষক ও শিক্ষিকার সমঅধিকার দাও,

পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ দাও,

নীতিনির্ধারণে শিক্ষকদের সংশ্লিষ্ট কর,

অধিকার রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য শিক্ষকদের সমষ্টিগতভাবে দরকষাকষির অধিকার দাও—

স্লোগানগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে বিদ্যমান পরিস্থিতি কি, তা সংক্ষেপে দেখা যাক।

উপযুক্ত কর্মপরিবেশ : উপযুক্তসংখ্যক ও আকারের শ্রেণীকক্ষ, খেলার মাঠ, পাঠাগার, বিদ্যুৎ, বিশুদ্ধ পানি, স্বাস্থ্যকর শৌচাগার, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত, গবেষণাগার, জার্নাল প্রভৃতি বহু কিছু উপাদান নিয়ে গঠিত হয় শিক্ষকদের কর্মপরিবেশ। এগুলোর প্রাপ্যতার কথা বিবেচনা করলে বলতে হয়, আমাদের দেশে সাধারণ মানুষ যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্তানদের পাঠায়, সেগুলোর কোনটিতেই সন্তোষজনক অবস্থা নেই। আমাদের শিক্ষার মান এত নিচু হওয়ার একটি বড় কারণ হচ্ছে উপযুক্ত কর্মপরিবেশের অভাব।

জীবনধারণের উপযোগী বেতন : বাংলাদেশে শিক্ষকদের বেতন জীবনধারণের জন্য আদৌ উপযোগী নয়। এ বেতন কতটা অকিঞ্চিতকর তা আমাদের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের বেতনের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। দেশে এগার প্রকার প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং শিক্ষক থাকলেও তাদের মূল দুটো ভাগ হচ্ছে বেসরকারি ও সরকারি।

এ দুটো গ্রুপের তুলনায় সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকরা খানিকটা ভালো অবস্থানে আছেন। সরকারি কর্মচারী হওয়ায় তাদের পুরো বেতন (সূচনা বেতন মাত্র ৩,১০০ টাকা) আসে সরকারি কোষাগার থেকে, তারা পান পেনশন, গ্র্যাচুয়িটি প্রভৃতি সুবিধা। এসব সুবিধা থেকে বঞ্চিত বেসরকারি শিক্ষকরা। এ দেশের বর্তমান বাজারদরে এসব বেতন যে আদৌ জীবনধারণের উপযোগী নয়, তা বোধহয় বলতে হবে না।

বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষকরাও জীবনধারণের উপযোগী বেতন পান না। এমনকি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও পান না জীবনধারণ উপযোগী বেতন।

৩. লিঙ্গ বৈষম্য : বেতন-ভাতায় শিক্ষকদের মধ্যে নীতিগতভাবে কোন বৈষম্য দেখা না গেলেও শিক্ষকতা পেশায় নারী শিক্ষকের

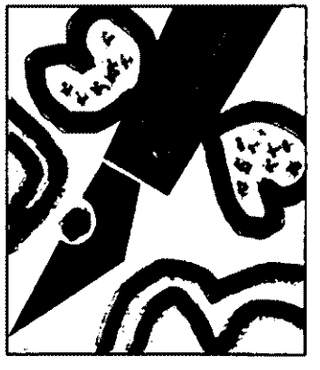

সংখ্যা অপ্রতুল। সরকারি নীতি মোতাবেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫০ ভাগ নারী শিক্ষক নিয়োগ করা যায়নি। নারীদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের সীমাবদ্ধতা এসবের কারণ হতে পারে।

৪. পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ : শিক্ষার নিম্নতর স্তরের শিক্ষকদের জন্য ট্রেনিং এবং উচ্চতর স্তরের শিক্ষকদের জন্য গবেষণা পেশাগত মান বৃদ্ধির নির্ভরযোগ্য উপায়। আমাদের দেশে প্রথমটির সুযোগ কিছুটা থাকলেও দ্বিতীয়টির সুযোগ মূলত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পেয়ে থাকেন। সরকারি কলেজ শিক্ষকরা কদাচিত পেলেও বেসরকারি কলেজ শিক্ষকরা এ সুযোগ আদৌ পান না।

বলা যায়, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে, বাংলাদেশে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের পেশাগত মান বৃদ্ধির সুযোগ বাস্তবে নেই।

৫. নীতিনির্ধারণে শিক্ষকদের ভূমিকা : বাংলাদেশে এ সুযোগ আছে মাত্র ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের। কারণ, এসব বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৩ অধ্যাদেশে পরিচালিত। আন্তর্জাতিক মানের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার এ ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকায় নীতিনির্ধারণে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এর বিপক্ষে সম্প্রতি প্রচার চলছে। প্রচারকরা ভুলে গেছেন, ২১ দফা ও ১১ দফা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের ফসল এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন। এসব অধিকারের অপব্যবহার করেছে মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তি। তাই এসব অধিকার বাতিল করার জোর সুপারিশ করছে কোন কোন মহল। মাঙ্গাবাধা হলে যেমন মাথা কেটে ফেলা যায় না, তেমনি ক্ষমতা ও সুযোগের অপব্যবহার হয়েছে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা বাতিল করা যায় না। তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় আর বিশ্ববিদ্যালয় থাকবে না।

আমাদের শিক্ষার মান দ্রুত বৃদ্ধি করতে হলে প্রয়োজন শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষকদের নীতিনির্ধারণে ভূমিকা রাখতে উদ্বুদ্ধ করা। তাছাড়া শিক্ষা নীতি প্রণয়ন, তার বাস্তবায়ন, পাঠক্রম বা পাঠ্যসূচি প্রণয়নে শিক্ষকদের ভূমিকা অগ্রগণ্য হওয়া উচিত। আর প্রতিষ্ঠান পরিচালনায়ও শিক্ষকদের মতামতের গুরুত্ব থাকা উচিত।

৬. অধিকার রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য শিক্ষকদের সমষ্টিগতভাবে দরকষাকষি করা : এ নীতি বাস্তবায়ন সম্ভব তখনই যখন ট্রেড ইউনিয়ন করার অবাধ অধিকার চালু থাকে। এ অধিকার নামে আমাদের শিক্ষকদের থাকলেও বাস্তবে এর কোন চর্চা নেই। আছে নানাবিধ বাধা। সরকারি শিক্ষকরা নিজেদের শিক্ষকের চেয়ে অফিসার ভাবতে বেশি পছন্দ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা কলেজ শিক্ষকদের সমস্যা নিয়ে ভাবেন না। কলেজ শিক্ষকদের বিদ্যালয় শিক্ষকদের সমস্যা নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই। বেসরকারি শিক্ষকদের চাকরির নিরাপত্তা না থাকায়, বহুবিধ কর্তৃপক্ষের অধীনে থাকায় এ অধিকার প্রয়োগে তারা খুব ভয় পান। তাই কোন স্তরের শিক্ষকই একান্ত বাধ্য না হলে দরকষাকষি বা আন্দোলন করে অধিকার অর্জনে আগ্রহী হন না। তদুপরি সমষ্টিগত দরকষাকষি সম্পর্কে দেশে রয়েছে অনেক ভুল ধারণা ও অপপ্রচার। এসব বাধা ও অপপ্রচার অতিক্রম করে শিক্ষক সমাজ তথা জাতিকে পথ দেখাতে পারে সঠিক লক্ষ্যে পরিচালিত শিক্ষক সংগঠনগুলো। বিশ্ব শিক্ষক দিবস অমর হোক।

ম. আখতারুজ্জামান : *সভাপতি, বিশ্ব শিক্ষক ফেডারেশন (WFTU/FISE); সভাপতি, বাংলাদেশ স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এবং অন্যতম আহ্বায়ক, বাংলাদেশ শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ*

সমকাল
05 OCT 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩
৪-৫